চিরায়ত বই

৭

গোরা

গোরা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গোরা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রকাশকাল

কবি প্রকাশনী প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২২

প্রকাশক

সজল আহমেদ

কবি প্রকাশনী

৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট

২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব

লেখক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস

মোবারক হোসেন

মুদ্রণ

কবি প্রেস

৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক

অভিযান পাবলিশার্স ১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

দে'জ পাবলিশিং কলেজ স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ৫৫০ টাকা

Gora a collection of novel by Rabindranath Tagore Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205
Kobi Prokashani First Edition: July 2022
Phone: 02-9668736 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 550 Taka RS: 550 US$ 30
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-96735-3-8

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন

www.kobibd.com or www.kanamachhi.com

অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১

www.rokomari.com/kobipublisher

অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর
কল্যাণীয়েষু

১৪ মাঘ ১৩১৬

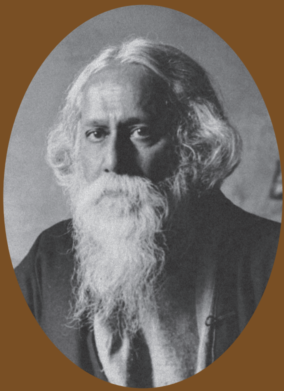

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ৭ মে ১৮৬১ সালে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে তাঁর জন্ম। প্রিন্স দ্বারকানাথের পৌত্র এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুত্র।

কৈশোরেই রবীন্দ্রনাথের মাতৃবিয়োগ হয়। পিতার সঙ্গ তাঁর জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর কৈশোরে সর্বাপেক্ষা প্রভাব বিস্তার করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্ত্রী কাদম্বিনী দেবী। রবীন্দ্রনাথ আজীবন এই মহিলার স্নেহস্মৃতি লালন করেছেন।

তাঁর প্রথম উল্লেখযোগ্য রচনা *বনফুল* (১৮৭২) এবং *কবিকাহিনী* (১৮৭৮)। এইগুলি তাঁর উন্মেষ পর্বের রচনা। *বাল্মীকি প্রতিভা* (১৮৮১) নাটক, *সন্ধ্যাসঙ্গীত* (১৮৮২), *প্রভাতসঙ্গীত* (১৮৮৩), *ছবি ও গান* (১৮৮৪), *কড়ি ও কোমল* (১৮৮৬) প্রভৃতি রচনা থেকেই তাঁর নিজস্ব প্রতিভার বিকাশ। ১৮৯০ সালে *মানসী* কাব্যের প্রকাশ। এই সময় থেকেই তাঁর সৃজনীশক্তি বিচিত্রপথে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হবার পূর্বেই তিনি বাংলাসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন।

১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত কবিতার *Gitanjali* নামে ইংরেজি অনুবাদ ইংল্যান্ডে প্রকাশিত হয়। মূলত এই গ্রন্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পান এবং সমগ্র বিশ্বে খ্যাতি লাভ করেন। ৭ আগস্ট ১৯৪১ সালে তিনি পরলোক গমন করেন।

১

শ্রাবণ মাসের সকালবেলায় মেঘ কাটিয়া গিয়া নির্মল রৌদ্রে কলিকাতার আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। রাস্তায় গাড়িঘোড়ার বিরাম নাই, ফেরিওয়ালা অবিশ্রাম হাঁকিয়া চলিয়াছে, যাহারা আপিসে কালেজে আদালতে যাইবে তাহাদের জন্য বাসায় বাসায় মাছ-তরকারির চুপড়ি আসিয়াছে ও রান্নাঘরে উনান জ্বালাইবার ধোঁওয়া উঠিয়াছে—কিন্তু তবু এত বড়ো এই-যে কাজের শহর কঠিনহৃদয় কলিকাতা, ইহার শত শত রাস্তা এবং গলির ভিতরে সোনার আলোকের ধারা আজ যেন একটা অপূর্ব যৌবনের প্রবাহ বহিয়া লইয়া চলিয়াছে।

এমন দিনে বিনা-কাজের অবকাশে বিনয়ভূষণ তাহার বাসার দোতলার বারান্দায় একলা দাঁড়াইয়া রাস্তায় জনতার চলাচল দেখিতেছিল। কালেজের পড়াও অনেক চুকিয়া গেছে, অথচ সংসারের মধ্যেও প্রবেশ করে নাই, বিনয়ের অবস্থাটা এইরূপ। সভাসমিতি চালানো এবং খবরের কাগজ লেখায় মন দিয়াছে—কিন্তু তাহাতে সব মনটা ভরিয়া উঠে নাই। অন্তত আজ সকালবেলায় কী করিবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া তাহার মনটা চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল। পাশের বাড়ির ছাতের উপরে গোটা-তিনেক কাক কী লইয়া ডাকাডাকি করিতেছিল এবং চড়ুই-দম্পতি তাহার বারান্দার এক কোণে বাসা-নির্মাণ-ব্যাপারে পরস্পরকে কিচিমিচি শব্দে উৎসাহ দিতেছিল—সেই-সমস্ত অব্যক্ত কাকলি বিনয়ের মনের মধ্যে একটা কোন্ অস্পষ্ট ভাবাবেগকে জাগাইয়া তুলিতেছিল।

আলখাল্লা-পরা একট বাউল নিকটে দোকানের সামনে দাঁড়াইয়া গান গাহিতে লাগিল—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনোবেড়ি দিতেম পাখির পায়।

বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল বাউলকে ডাকিয়া এই অচিন পাখির গানটা লিখিয়া লয়, কিন্তু ভোর-রাত্রে যেমন শীত-শীত করে অথচ গায়ের কাপড়টা টানিয়া লইতে উদ্যম থাকে না, তেমনি একটা আলস্যের ভাবে বাউলকে ডাকা হইল না, গান লেখাও হইল না, কেবল ঐ অচেনা পাখির সুরটা মনের মধ্যে গুন্ গুন্ করিতে লাগিল।

এমন সময় ঠিক তাহার বাসার সামনেই একটা ঠিকাগাড়ির উপরে একটা মস্ত জুড়িগাড়ি আসিয়া পড়িল এবং ঠিকাগাড়ির একটা চাকা ভাঙিয়া দিয়া দৃকপাত না করিয়া বেগে চলিয়া গেল। ঠিকাগাড়িটা সম্পূর্ণ উলটাইয়া না পড়িয়া এক পাশে কাত হইয়া পড়িল।

বিনয় তাড়াতাড়ি রাস্তায় বাহির হইয়া দেখিল গাড়ি হইতে একটি সতেরো-আঠারো বৎসরের মেয়ে নামিয়া পড়িয়াছে, এবং ভিতর হইতে একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক নামিবার উপক্রম করিতেছেন।

বিনয় তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া দিল, এবং তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার লাগে নি তো?"

তিনি "না, কিছু হয় নি" বলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিলেন, সে হাসি তখনই মিলাইয়া গেল এবং তিনি মূর্ছিত হইয়া পড়িবার উপক্রম করিলেন। বিনয় তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল ও উৎকণ্ঠিত মেয়েটিকে কহিল, "এই সামনেই আমার বাড়ি; ভিতরে চলুন।"

বৃদ্ধকে বিছানায় শোওয়ানো হইলে মেয়েটি চারি দিকে তাকাইয়া দেখিল ঘরের কোণে একটি জলের কুঁজা আছে। তখনই সেই কুঁজার জল গেলাসে করিয়া লইয়া বৃদ্ধের মুখে ছিটা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল এবং বিনয়কে কহিল, "একজন ডাক্তার ডাকলে হয় না?"

বাড়ির কাছেই ডাক্তার ছিল। বিনয় তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে বেহারা পাঠাইয়া দিল।

ঘরের এক পাশে টেবিলের উপরে একটা আয়না, তেলের শিশি ও চুল আঁচড়াইবার সরঞ্জাম ছিল। বিনয় সেই মেয়েটির পিছনে দাঁড়াইয়া সেই আয়নার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিল।

বিনয় ছেলেবেলা হইতেই কলিকাতার বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছে। সংসারের সঙ্গে তাহার যাহা-কিছু পরিচয় সে-সমস্তই বইয়ের ভিতর দিয়া। নিঃসম্পর্কীয়া ভদ্রস্ত্রীলোকের সঙ্গে তাহার কোনোদিন কোনো পরিচয় হয় নাই।

আয়নার দিকে চাহিয়া দেখিল, যে মুখের ছায়া পড়িয়াছে সে কী সুন্দর মুখ! মুখের প্রত্যেক রেখা আলাদা করিয়া দেখিবার মতো তাহার চোখের অভিজ্ঞতা ছিল না। কেবল সেই উদ্‌বিগ্ন স্নেহে আনত তরুণ মুখের কোমলতামণ্ডিত উজ্জ্বলতা বিনয়ের চোখে সৃষ্টির সদ্যঃপ্রকাশিত একটি নূতন বিস্ময়ের মতো ঠেকিল।

একটু পরে বৃদ্ধ অল্পে অল্পে চক্ষু মেলিয়া "মা" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। মেয়েটির তখন দুই চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া বৃদ্ধের মুখের কাছে মুখ নিচু করিয়া আর্দ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তোমার কোথায় লেগেছে?"

"এ আমি কোথায় এসেছি" বলিয়া বৃদ্ধ উঠিয়া বসিবার উপক্রম করিতেই বিনয় সম্মুখে আসিয়া কহিল, "উঠবেন না— একটু বিশ্রাম করুন, ডাক্তার আসছে।"

তখন তাঁহার সব কথা মনে পড়িল ও তিনি কহিলেন, "মাথার এইখানটায় একটু বেদনা বোধ হচ্ছে, কিন্তু গুরুতর কিছুই নয়।"

সেই মুহূর্তেই ডাক্তার জুতা মচ্ মচ্ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনিও বলিলেন, "বিশেষ কিছুই নয়।" একটু গরম দুধ দিয়া অল্প ব্রাণ্ডি খাইবার ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার চলিয়া যাইতেই বৃদ্ধ অত্যন্ত সংকুচিত ও ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার মেয়ে তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া কহিল, "বাবা, ব্যস্ত হচ্ছ কেন? ডাক্তারের ভিজিট ও ওষুধের দাম বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দেব।"

বলিয়া সে বিনয়ের মুখের দিকে চাহিল।

সে কী আশ্চর্য চক্ষু! সে চক্ষু বড়ো কি ছোটো, কালা কি কটা সে তর্ক মনেই আসে না—প্রথম নজরেই মনে হয়, এই দৃষ্টির একটা অসন্দিগ্ধ প্রভাব আছে। তাহাতে সংকোচ নাই, দ্বিধা নাই, তাহা একটা স্থির শক্তিতে পূর্ণ।

বিনয় বলিতে চেষ্টা করিল, "ভিজিট অতি সামান্য, সেজন্যে—সে আপনারা—সে আমি—"

মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকাতে কথাটা টিকমত শেষ করিতেই পারিল না। কিন্তু ভিজিটের টাকাটা যে তাহাকে লইতেই হইবে সে সম্বন্ধে কোনো সংশয় রহিল না।

বৃদ্ধ কহিলেন, "দেখুন, আমার জন্যে ব্রাণ্ডির দরকার নেই—"

কন্যা তাঁহাকে বাধা দিয়া কহিল, "কেন বাবা, ডাক্তারবাবু যে বলে গেলেন।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "ডাক্তাররা অমন বলে থাকে, ওটা ওদের একটা কুসংস্কার। আমার যেটুকু দুর্বলতা আছে একটু গরম দুধ খেলেই যাবে।"

দুধ খাইয়া বল পাইলে বৃদ্ধ বিনয়কে কহিলেন, "এবারে আমরা যাই। আপনাকে বড়ো কষ্ট দিলুম।"

মেয়েটি বিনয়ের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "একটা গাড়ি—"

বৃদ্ধ সংকুচিত হইয়া কহিলেন, "আবার কেন ওঁকে ব্যস্ত করা? আমাদের বাসা তো কাছেই, এটুকু হেঁটেই যাব।"

মেয়েটি বলিল, "না বাবা, সে হতে পারে না।"

বৃদ্ধ ইহার উপর কোনো কথা কহিলেন না এবং বিনয় নিজে গিয়া গাড়ি ডাকিয়া আনিল। গাড়িতে উঠিবার পূর্বে বৃদ্ধ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নামটি কী?"

বিনয়। আমার নাম বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়।

বৃদ্ধ কহিলেন, "আমার নাম পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য। নিকটেই ৭৮ নম্বর বাড়িতে থাকি। কখনো অবকাশমত যদি আমাদের ওখানে যান তো বড়ো খুশি হব।"

মেয়েটি বিনয়ের মুখের দিকে দুই চোখ তুলিয়া নীরবে এই অনুরোধের সমর্থন করিল। বিনয় তখনই সেই গাড়িতে উঠিয়া তাঁহাদের বাড়িতে যাইতে প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সেটা ঠিক শিষ্টাচার হইবে কি না ভাবিয়া না পাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। গাড়ি ছাড়িবার সময় মেয়েটি বিনয়কে ছোটো একটা নমস্কার করিল। এই নমস্কারের জন্য বিনয় একেবারেই প্রস্তুত ছিল না, এইজন্য হতবুদ্ধি হইয়া সে প্রতিনমস্কার করিতে পারিল না। এইটুকু ত্রুটি লইয়া বাড়িতে ফিরিয়া সে নিজেকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগিল। ইঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতে বিদায় হওয়া পর্যন্ত বিনয় নিজের আচরণ সমস্তটা আলোচনা করিয়া দেখিল; মনে হইল, আগাগোড়া তাহার সমস্ত ব্যবহারেই অসভ্যতা প্রকাশ পাইয়াছে। কোন্ কোন্ সময়ে কী করা উচিত ছিল, কী বলা উচিত ছিল, তাহা লইয়া মনে মনে কেবলই বৃথা আন্দোলন করিতে লাগিল। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, যে রুমাল দিয়া মেয়েটি তাহার বাপের মুখ মুছাইয়া দিয়াছিল সেই রুমালটি বিছানার উপর পড়িয়া আছে—সেটা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইল। তাহার মনের মধ্যে বাউলের সুরে ঐ গানটা বাজিতে লাগিল—

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়।

বেলা বাড়িয়া চলিল, বর্ষার রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল, গাড়ির স্রোত আপিসের দিকে বেগে ছুটিতে লাগিল, বিনয় তাহার দিনের কোনো কাজেই মন দিতে পারিল না। এমন অপূর্ব আনন্দের সঙ্গে এমন নিবিড় বেদনা তাহার বয়সে কখনো সে ভোগ করে নাই। তাহার এই ক্ষুদ্র বাসা এবং চারি দিকের কুৎসিত কলিকাতা মায়াপুরীর মতো হইয়া উঠিল; যে রাজ্যে অসম্ভব সম্ভব হয়, অসাধ্য সিদ্ধ হয় এবং অপরূপ রূপ লইয়া দেখা দেয়, বিনয় যেন সেই নিয়ম-ছাড়া রাজ্যে ফিরিতেছে। এই বর্ষাপ্রভাতের রৌদ্রের দীপ্ত আভা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার রক্তের মধ্যে প্রবাহিত হইল, তাহার অন্তঃকরণের সম্মুখে একটা জ্যোতির্ময় যবনিকার মতো পড়িয়া প্রতিদিনের জীবনের সমস্ত তুচ্ছতাকে একেবারে আড়াল করিয়া দিল। বিনয়ের ইচ্ছা করিতে লাগিল নিজের পরিপূর্ণতাকে আশ্চর্যরূপে প্রকাশ করিয়া দেয়, কিন্তু তাহার কোনো উপায় না পাইয়া তাহার চিত্ত পীড়িত হইতে লাগিল। অত্যন্ত সামান্য লোকের মতোই সে আপনার পরিচয় দিয়াছে—তাহার বাসাটা অত্যন্ত তুচ্ছ, জিনিসপত্র নিতান্ত এলোমেলো, বিছানাটা পরিষ্কার নয়, কোনো-কোনো দিন তাহার ঘরে সে ফুলের তোড়া সাজাইয়া রাখে, কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য—সেদিন

তাহার ঘরে একটা ফুলের পাপড়িও ছিল না। সকলেই বলে বিনয় সভাস্থলে মুখে মুখে যেরূপ সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারে কালে সে একজন মস্ত বক্তা হইয়া উঠিবে, কিন্তু সেদিন সে এমন একটা কথাও বলে নাই যাহাতে তাহার বুদ্ধির কিছুমাত্র প্রমাণ হয়। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, 'যদি এমন হইতে পারিত যে সেই বড়ো গাড়িটা যখন তাঁহাদের গাড়ির উপর আসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে আমি বিদ্যুদ্‌বেগে রাস্তার মাঝখানে আসিয়া অতি অনায়াসে সেই উদ্দাম জুড়িঘোড়ার লাগাম ধরিয়া থামাইয়া দিতাম!' নিজের সেই কাল্পনিক বিক্রমের ছবি যখন তাহার মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল তখন একবার আয়নায় নিজের চেহারা না দেখিয়া থাকিতে পারিল না।

এমন সময় দেখিল একটি সাত-আট বছরের ছেলে রাস্তায় দাঁড়াইয়া তাহার বাড়ির নম্বর দেখিতেছে। বিনয় উপর হইতে বলিল, "এই-যে, এই বাড়িই বটে।" ছেলেটি যে তাহারই বাড়ির নম্বর খুঁজিতেছিল সে সম্বন্ধে তাহার মনে সন্দেহমাত্র হয় নাই। তাড়াতাড়ি বিনয় সিঁড়ির উপর চটিজুতা চট্‌ চট্‌ করিতে করিতে নীচে নামিয়া গেল—অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ছেলেটিকে ঘরের মধ্যে লইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

সে কহিল, "দিদি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে।"

এই বলিয়া বিনয়ভূষণের হাতে এক পত্র দিল।

বিনয় চিঠিখানা লইয়া প্রথমে লেফাফার উপরটাতে দেখিল, পরিষ্কার মেয়েলি ছাঁদের ইংরেজি অক্ষরে তাহার নাম লেখা। ভিতরে চিঠিপত্র কিছুই নাই, কেবলই কয়েকটি টাকা আছে।

ছেলেটি চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বিনয় তাহাকে কোনোমতেই ছাড়িয়া দিল না। তাহার গলা ধরিয়া তাহাকে দোতলার ঘরে লইয়া গেল।

ছেলেটির রঙ তাহার দিদির চেয়ে কালো, কিন্তু মুখের ছাঁদে কতকটা সাদৃশ্য আছে। তাহাকে দেখিয়া বিনয়ের মনে ভারি একটা স্নেহ এবং আনন্দ জন্মিল।

ছেলেটি বেশ সপ্রতিভ। সে ঘরে ঢুকিয়া একটা ছবি দেখিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "এ কার ছবি?"

বিনয় কহিল, "এ আমার একজন বন্ধুর ছবি।"

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল, "বন্ধুর ছবি? আপনার বন্ধু কে?"

বিনয় হাসিয়া কহিল, "তুমি তাঁকে চিনবে না। আমার বন্ধু গৌরমোহন, তাঁকে গোরা বলি। আমরা ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে পড়েছি।"

"এখনো পড়েন?"

"না, এখন আর পড়ি নে।"

“আপনার স—ব পড়া হয়ে গেছে?”

বিনয় এই ছোটো ছেলেটির কাছেও গর্ব করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া কহিল, “হাঁ, সব পড়া হয়ে গেছে।”

ছেলেটি বিস্মিত হইয়া একটু নিশ্বাস ফেলিল। সে বোধ হয় ভাবিল, এত বিদ্যা সেও কত দিনে শেষ করিতে পারিবে।

বিনয়। তোমার নাম কী?

“আমার নাম শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।”

বিনয় বিস্মিত হইয়া কহিল, “মুখোপাধ্যায়?”

তাহার পরে একটু একটু করিয়া পরিচয় পাওয়া গেল। পরেশবাবু ইহাদের পিতা নহেন—তিনি ইহাদের দুই ভাইবোনকে ছেলেবেলা হইতে পালন করিয়াছেন। ইহার দিদির নাম আগে ছিল রাধারানী—পরেশবাবুর স্ত্রী তাহা পরিবর্তন করিয়া ‘সুচরিতা’ নাম রাখিয়াছেন।

দেখিতে দেখিতে বিনয়ের সঙ্গে সতীশের খুব ভাব হইয়া গেল। সতীশ যখন বাড়ি যাইতে উদ্যত হইল বিনয় কহিল, “তুমি একলা যেতে পারবে?”

সে গর্ব করিয়া কহিল, “আমি তো একলা যাই!”

বিনয় কহিল, “আমি তোমাকে পৌঁছে দিই গে।”

তাহার শক্তির প্রতি বিনয়ের এই সন্দেহ দেখিয়া সতীশ ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, “কেন, আমি তো একলা যেতে পারি।” এই বলিয়া তাহার একলা যাতায়াতের অনেকগুলি বিস্ময়কর দৃষ্টান্তের সে উল্লেখ করিতে লাগিল। কিন্তু তবু যে বিনয় কেন তাহার বাড়ির দ্বার পর্যন্ত তাহার সঙ্গে গেল তাহার ঠিক কারণটি বালক বুঝিতে পারিল না।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল, “আপনি ভিতরে আসবেন না?”

বিনয় সমস্ত মনকে দমন করিয়া কহিল, “আর-এক দিন আসব।”

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বিনয় সেই শিরোনামা-লেখা লেফাফা পকেট হইতে বাহির করিয়া অনেকক্ষণ দেখিল—প্রত্যেক অক্ষরের টান ও ছাঁদ একরকম মুখস্থ হইয়া গেল—তার পরে টাকা-সমেত সেই লেফাফা বাক্সের মধ্যে যত্ন করিয়া রাখিয়া দিল। এ কয়টা টাকা যে কোনো দুঃসময়ে খরচ করিবে এমন সম্ভাবনা রহিল না।

২

বর্ষার সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকার যেন ভিজিয়া ভারী হইয়া পড়িয়াছে। বর্ণহীন বৈচিত্র্যহীন মেঘের নিঃশব্দ শাসনের নীচে কলিকাতা শহর একা প্রকাণ্ড নিরানন্দ কুকুরের মতো লেজের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া কুণ্ডলী

পাকাইয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে। কাল সন্ধ্যা হইতে টিপ টিপ করিয়া কেবলই বর্ষণ হইয়াছে; সে বৃষ্টিতে রাস্তার মাটিকে কাদা করিয়া তুলিয়াছে কিন্তু কাদাকে ধুইয়া ভাসাইয়া লইয়া যাইবার মতো বল প্রকাশ করে নাই। আজ বেলা চারটে হইতে বৃষ্টি বন্ধ আছে, কিন্তু মেঘের গতিক ভালো নয়। এইরূপ আসন্ন বৃষ্টির আশঙ্কায় সন্ধ্যাবেলায় নির্জন ঘরের মধ্যে যখন মন টেকে না এবং বাহিরেও যখন আরাম পাওয়া যায় না সেই সময়টাকে দুটি লোক একটি তেতলা বাড়ির স্যাঁতসেঁতে ছাতে দুটি বেতের মোড়ার উপর বসিয়া আছে।

এই দুই বন্ধু যখন ছোটো ছিল তখন ইস্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়া এই ছাতে ছুটাছুটি খেলা করিয়াছে; পরীক্ষার পূর্বে উভয়ে চীৎকার করিয়া পড়া আবৃত্তি করিতে করিতে এই ছাতে দ্রুতপদে পাগলের মতো পায়চারি করিয়া বেড়াইয়াছে; গ্রীষ্মকালে কালেজ হইতে ফিরিয়া রাত্রে এই ছাতের উপরেই আহার করিয়াছে, তার পরে তর্ক করিতে করিতে কতদিন রাত্রি দুইটা হইয়া গেছে এবং সকালে রৌদ্র আসিয়া যখন তাহাদের মুখের উপর পড়িয়াছে তখন চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখিয়াছে, সেইখানেই মাদুরের উপরে দুই জনে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। কালেজে পাস করা যখন একটাও আর বাকি রহিল না তখন এই ছাতের উপরে মাসে একবার করিয়া যে হিন্দুহিতৈষী সভার অধিবেশন হইয়া আসিয়াছে এই দুই বন্ধুর মধ্যে একজন তাহার সভাপতি এবং আর-এক জন তাহার সেক্রেটারি।

যে ছিল সভাপতি তাহার নাম গৌরমোহন; তাহাকে আত্মীয়বন্ধুরা গোরা বলিয়া ডাকে। সে চারি দিকের সকলকে যেন খাপছাড়া রকমে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তাহাকে তাহার কালেজের পণ্ডিতমহাশয় রজতগিরি বলিয়া ডাকিতেন। তাহার গায়ের রঙটা কিছু উগ্র রকমের সাদা—হলদের আভা তাহাকে একটুও স্নিগ্ধ করিয়া আনে নাই। মাথায় সে প্রায় ছয় ফুট লম্বা, হাড় চওড়া, দুই হাতের মুঠা যেন বাঘের থাবার মতো বড়ো—গলার আওয়াজ এমনি মোটা ও গম্ভীর যে হঠাৎ শুনিলে "কে রে" বলিয়া চমকিয়া উঠিতে হয়। তাহার মুখের গড়নও অনাবশ্যক রকমের বড়ো এবং অতিরিক্ত রকমের মজবুত; চোয়াল এবং চিবুকের হাড় যেন দুর্গদ্বারের দৃঢ় অর্গলের মতো; চোখের উপর ভ্রূরেখা নাই বলিলেই হয় এবং সেখানকার কপালটা কানের দিকে চওড়া হইয়া গেছে। ওষ্ঠাধর পাতলা এবং চাপা; তাহার উপরে নাকটা খাঁড়ার মতো ঝুঁকিয়া আছে। দুই চোখ ছোটো কিন্তু তীক্ষ্ণ; তাহার দৃষ্টি যেন তীরের ফলাটার মতো অতদূর অদৃশ্যের দিকে লক্ষ ঠিক করিয়া আছে অথচ এক মুহূর্তের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া কাছের জিনিসকেও বিদ্যুতের মতো আঘাত করিতে পারে। গৌরকে দেখিতে ঠিক সুশ্রী বলা যায় না, কিন্তু

তাহাকে না দেখিয়া থাকিবার জো নাই, সে সকলের মধ্যে চোখে পড়িবেই।

আর তাহার বন্ধু বিনয় সাধারণ বাঙালি শিক্ষিত ভদ্রলোকের মতো নম্র, অথচ উজ্জ্বল; স্বভাবের সৌকুমার্য ও বুদ্ধির প্রখরতা মিলিয়া তাহার মুখশ্রীতে একটি বিশিষ্টতা দিয়াছে। কালেজে সে বরাবরই উচ্চ নম্বর ও বৃত্তি পাইয়া আসিয়াছে; গোরা কোনোমতেই তাহার সঙ্গে সমান বলিতে পারিত না। পাঠ্যবিষয়ে গোরার তেমন আসক্তিই ছিল না; বিনয়ের মতো সে দ্রুত বুঝিতে এবং মনে রাখিতে পারিত না। বিনয়ই তাহার বাহন হইয়া কালেজের পরীক্ষা কয়টার ভিতর দিয়া নিজের পশ্চাতে তাহাকে টানিয়া পার করিয়া আনিয়াছে।

গোরা বলিতেছিল, "শোনো বলি। অবিনাশ যে ব্রাহ্মদের নিন্দে করছিল, তাতে এই বোঝা যায় যে লোকটা বেশ সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় আছে। এতে তুমি হঠাৎ অমন খাপা হয়ে উঠলে কেন?"

বিনয়। কী আশ্চর্য। এ সম্বন্ধে যে কোনো প্রশ্ন চলতে পারে তাও আমি মনে করতে পারতুম না।

গোরা। তা যদি হয় তবে তোমার মনে দোষ ঘটেছে। এক দল লোক সমাজের বাঁধন ছিঁড়ে সব বিষয়ে উলটোরকম করে চলবে আর সমাজের লোক অবিচলিতভাবে তাদের সুবিচার করবে এ স্বভাবের নিয়ম নয়। সমাজের লোকে তাদের ভুল বুঝবেই, তারা সোজা ভাবে যেটা করবে এদের চোখে সেটা বাঁকা ভাবে পড়বেই, তাদের ভালো এদের কাছে মন্দ হয়ে দাঁড়াবেই, এইটেই হওয়া উচিত। ইচ্ছামত সমাজ ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার যতগুলো শাস্তি আছে এও তার মধ্যে একটা।

বিনয়। যেটা স্বাভাবিক সেইটেই যে ভালো, তা আমি বলতে পারি নে।

গোরা একটু উষ্ণ হইয়া উঠিয়া কহিল, "আমার ভালোয় কাজ নেই। পৃথিবীতে ভালো দু-চারজন যদি থাকে তো থাক্ কিন্তু বাকি সবাই যেন স্বভাবিক হয়। নইলে কাজও চলে না, প্রাণও বাঁচে না। ব্রাহ্ম হয়ে বাহাদুরি করবার শখ যাদের আছে অব্রাহ্মরা তাদের সব কাজেই ভুল বুঝে নিন্দে করবে এটুকু দুঃখ তাদের সহ্য করতেই হবে। তারাও বুক ফুলিয়া বেড়াবে আর তাদের বিরুদ্ধ পক্ষও তাদের পিছন পিছন বাহবা দিয়া চলবে জগতে এটা ঘটে না, ঘটলেও জগতের সুবিধে হত না।"

বিনয়। আমি দলের নিন্দের কথা বলছি নে—ব্যক্তিগত—

গোরা। দলের নিন্দে আবার নিন্দে কিসের! সে তো মতামত-বিচার। ব্যক্তিগত নিন্দেই তো চাই। আচ্ছা সাধুপরুষ, তুমি নিন্দে করতে না?